জনস্মৃতির সীমান্তে দলের চৌকি পেরিয়ে

বিশ্বজিৎ রায়

'সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের শহিদদের ভুলছি না, ভুলব না।'
'তাপসী মালিক অমর রহে।'
'কাটোয়া থেকে কামদুনি, যেই শাসক সেই খুনি।'
'পার্ক স্ট্রিট থেকে মধ্যমগ্রাম আমাদের লজ্জা।'

দুই মিছিলের চার শ্লোগান। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শিবিরের নারী-পুরুষ সমর্থকদের মুখে। একটির লক্ষ্য প্রাক্তন শাসক ও অধুনা বিরোধীদের আমলের ধর্ষণ-খুন- নির্যাতনের কুকীর্তিগুলির স্মৃতি জনমানসে জাগিয়ে রাখা। অপরটির উদ্দেশ্য, সাবেক বিরোধী ও বর্তমান শাসকদের 'পরিবর্তন' সাফল্যের ঢোলটি ফাঁসানো এবং দ্বিচারিতার মুখোশ উন্মোচন। প্রথম মিছিলে মা-মাটি-মানুষের সরকারের ঘনিষ্ঠ এবং প্রসাদধন্য বুদ্ধিজীবীরা হাঁটেন। দ্বিতীয়টিতে হাঁটেন ক্ষমতাচ্যুত বামপন্থীদের ঘনিষ্ঠরা যারা একদা 'বুদ্ধজীবী' বলে খ্যাত ছিলেন। এদেরও একাংশ এখন দিদি-অনুরাগী। আবার দিদি ও তার দলের শাসনে বীতশ্রদ্ধ কেউ কেউ এখন বামেদের মিছিলে। তৃতীয় একটি মিছিলও মাঝেমধ্যে দেখা যায়। হরেক কিসিমের নকশালপন্থীরাই এর মাথা। এই মিছিলের অনেকে বিগত জমানায় দিদির পাশে ছিলেন। তাদের শ্লোগান—'বানতলা থেকে ধানতলা, নন্দীগ্রাম থেকে মধ্যমগ্রাম, আমাদের সংগ্রাম।' তবে এরা অতীব ক্ষীণকণ্ঠ। এবং প্রাক্তন ও বর্তমান শাসকদের মধ্যে কোন্ পক্ষ এখন বড়ো শত্রু তা নিয়ে বখেরায় বিভক্ত। নিজেদের মধ্যে আকচাআকচিতেই এদের দম ফুরোয়। সে-কথায় পরে আসছি।

সব পক্ষই মিছিল ডাকে নাগরিকের নামে। কোনো বিশেষ দল বা শিবিরের নামে মিছিল ডাকলে সংকীর্ণ রাজনীতির ছাপ্পা মারতে প্রতিপক্ষের সুবিধে। পাবলিকও ভালো নেয় না। তাই ঘুরিয়ে নাক দেখানোর ব্যবস্থা। প্রধান দুই শিবিরের কায়দা হলো তারা জনস্মৃতিতে নিজেদের সুবিধে মতো দাঁড়ি টানতে চায়। এক্ষেত্রে দাঁড়ি টানার নানা উপায়। শ্লোগানগুলিতেই স্পষ্ট, দুঃস্মৃতির স্মারক অঞ্চল, ঘটনাস্থলগুলি এবং অত্যাচারের শিকার তথা শহিদদের নামে দাগা বুলোনো হচ্ছে রাজনৈতিক শিবিরের অঙ্ক অনুসারে। তোমার শহিদ আমার গণশত্রু বা নেহাত এলেবেলে। তুমি যার জন্য কাঁদবে, পবিত্র ক্রোধ উগরে দিয়ে অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর যুদ্ধ জারি রাখার শপথ নেবে, আমি তার নামে কুৎসা করব মৃত্যুর পরও, হাসাহাসি করব পাশবিক ইঙ্গিতে। এমনকি তার মৃত্যু অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর পথে যাত্রার মাইলস্টোন হয়ে উঠবে আমার কাছে। যারা সিঙ্গুরে তাপসী মালিকের জন্য কেঁদেছে, তার ধর্ষিতা, দগ্ধ অঙ্গার-প্রায় লাশ ছুঁয়ে প্রতিশোধে-প্রতিরোধে উত্তাল হয়েছে, নন্দীগ্রামে পঙ্গু শঙ্কর সামন্তের দগ্ধ মৃতদেহ তাদের মনে ন্যূনতম মানবিক করুণার দাবি তোলেনি। সে তো হার্মাদদের হামলার বিরুদ্ধে জনরোষের শিকার মাত্র। যেমন অপর শিবিরের কাছে তাপসীর ভয়ংকর মৃত্যু শিল্পায়ন-বিরোধীদের নিজেদের খেয়োখেয়ি এবং পারিবারিক নোংরামির ফসল। এমন 'সিলেকটিভ ইমোটিং' বা পাত্রবিশেষে দয়ামায়া, করুণা তথা মানবিকতার উদ্রেকের ঘটনা ভুরি ভুরি। দুই শিবিরের নেতাদের দু'রকম মুখই বারবার দেখেছে বঙ্গবাসী। এই পাত্রনির্বাচন, অন্য রাজ্যের তুলনায়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। সব মরণ নয় সমান। কোনো কোনো মৃত্যু পাহাড়ের চেয়ে ভারী, কোনোটা আবার পাখির পালকের মতো হালকা। আমার পক্ষের ঘরছাড়াদের জন্য কেঁদে ভাসাবো, তাদের শিবিরে ক্ষুধার্ত বা আহত শিশুকে কোলে নিয়ে, স্বামীহারা নারীকে বুকে টেনে প্রতিপক্ষের নির্দয় অমানবিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হব। কিন্তু আমার দলের লোকেরা যাদের ঘরদোরে আগুন দিচ্ছে, লুটতরাজ করছে, মেয়ে-বুড়ো-বাচ্চাদেরও পেটাচ্ছে বা মরদদের খুন করছে—তারা সব দুষ্কৃতি, সমাজের শত্রু, শান্তি ও উন্নয়নের বিরোধী তাই জনরোষের শিকার। এ ভাবে জনস্মৃতিকে হিংসার 'ন্যায্য ও অন্যায্য' শিকারদের মধ্যে ভেদাভেদ করতে শেখানো হয় প্রতিনিয়ত। ভঙ্গবঙ্গে শুধু নয়, গণতন্ত্রের গুরুঠাকুর আমেরিকানদের দেশেও এটা কী ভাবে প্রতিনিয়ত চলে তা নোম চমস্কি বারংবার দেখিয়েছেন। সেই অনুযায়ী, মানুষ বা জনগণের নামে হেদিয়ে-মরা নেতা-নেত্রীদের আবেগ-প্রদর্শনী এবং জনকরুণা ও ক্রোধ উৎপাদনের ব্যবস্থা। জনস্মৃতি নিয়ন্ত্রণের আর একটি উপায় হচ্ছে একটি বা একাধিক কালপর্ব যা নির্দিষ্ট শাসনকালের চিহ্নবাচক— তাকে দুঃস্মৃতির পর্ব বলে চিহ্নিত করা। যেমন '৩৪ বছর'। অথবা জনপ্রিয় রাজনৈতিক মালাবদলের স্মারক—যেমন 'পরিবর্তন'। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণকে যে যার মতো একটি 'কাট অফ-ইয়ার' বা ছেদবর্ষ দিয়েও নির্দিষ্ট করে--- যেমন ১৯৭১, ২০১১। শুধু রাজনৈতিক দলগুলির বয়ানে নয়, তাদের অনুরাগী বুদ্ধিজীবীদের তৈরি ইতিহাসের বাখানেও এই কালপর্ব বা ছেদচিহ্নর অপার মহিমা। এর এক পারে প্রগতি, অন্য পারে প্রতিক্রিয়ার কাল। সুশাসন-কুশাসন, রামরাজ্য-রাবণরাজ্য, গণতন্ত্র-একনায়কতন্ত্র, উন্নয়ন-অনুন্নয়ন এ ভাবে কালরেখায় বিভক্ত। যেমন ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সাদা ও কালো শাসকদের মধ্যে বিভাজন-রেখা টেনেছে। ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থা, '৭৭-এর ইন্দিরা পতন, '৮৪-র শিখনিধন, '৯২-এর বাবরি মসজিদ ধ্বংস বা ২০০১-এর গুজরাতে মুসলমান নিধন স্বাধীনোত্তর ভারতের কতগুলি বড়ো মাইলস্টোন বা সময়ফলক। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকারের অভিষেক এবং ২০১১-য় তার পতন ও তৃণমূল সরকারের উত্থান এমনই পর্বান্তরের চিহ্ন। শেষতম 'ওয়াটারশেড' ঘটনা ২০১৪-য় নরেন্দ্র মোদীর ভারত বিজয় এবং

সংসদে বিজেপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এইসব পর্বচিহ্ন রাজনৈতিক শিবিরগুলির বিভাজক চিহ্নও বটে। দলের লোকেরা স্মৃতির সীমান্ত রক্ষায় চৌকি দেয়।

যে-সব গোলা লোক পর্ব ভাগ বা বিভাজক চিহ্নগুলিকে কেবলই গুলিয়ে ফেলে, তাদের দুই সীমান্তের মাঝে 'নো ম্যানস ল্যান্ডে' আটকে থাকতে হবে। দুই তরফের সীমান্তরক্ষীরা তাদের অনুপ্রবেশকারী বলে খেদাবে, জেলে পুরে দেবে। ত্রিশঙ্কু, রাষ্ট্রহীনদের মতো ঝুলিয়ে রাখবে। নাগরিকের রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের মতোই রাজনৈতিক আনুগত্যের চিহ্নবাহী কালপর্বগুলিকে অস্বীকার করলে বেশ ভুগতে হয়। দেশের মধ্যে নানা স্বার্থসংঘাত ও বিবাদ থাকলেও বহিঃশত্রুর হুমকি হামলার মুখে দলমত নির্বিশেষে জাতীয়তাবাদী নাকাড়া বাজিয়ে দেশপ্রেমের পরীক্ষা দিতে হয়। তেমনই দেশের ভিতরে বিশেষ শাসনপর্বে শাসক দল ও তার বৃহত্তর শিবিরে ঘরোয়া কোঁদল থাকলেও নানা ক্ষেত্রে আমাদের এই শিবিরভুক্তি অস্বীকার করলে অশেষ ভোগান্তি। হয় ব্রাজিল, নয় আর্জেন্টিনা অথবা জার্মানির সাপোর্টার হতেই হবে। নিছক ফুটবল-প্রেমীরা সিরিয়াস ক্রীড়ামোদী বলে কস্কে পান না। কাগজে বা টিভিতে তাদের ছবি বেরোয় না। নিরপেক্ষতাকে সুবিধাবাদী ধান্দাবাজি বলে গালাগাল করে রাজনীতির ভিতরে বাইরের লোকেরা। তাই প্রধান শত্রু বা মন্দের ভালো বাছতেই হবে।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে কামদুনি-মধ্যমগ্রাম

যারা তাপসী মালিক, নন্দীগ্রামের ধর্ষিতা মেয়েদের শরীরে, গুমখুনদের কঙ্কালে দাগা বুলিয়ে রাজ্যের জনস্মৃতিকে জাগিয়ে রাখতে চাইছেন, তাদের খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছে। যাতে স্থানীয় জনস্মৃতি জেগে না ওঠে কী ভাবে ক্ষমতায় আজকের শাসকপক্ষ শহিদদের স্মৃতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ১৪ মার্চের গুলিচালনাকারী অফিসারদের শাস্তির দলে পদোন্নতি হয়েছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ধর্ষিতা, গুমখুন, নিখোঁজদের কথা দিদি বা তার দলের মুখে আজ তেমন শোনা যায় না। আন্দোলনের স্মৃতি, হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি দলীয় দিবস পালনেই সীমাবদ্ধ। যেমন হারিয়ে গিয়েছে আট-নয়ের দশকের চম্পলা সর্দার, দীপালি বসাকদের মতো বহু মেয়ের নাম যাদের উপর তৎকালীন শাসকদলের কর্মী-সমর্থকদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগে দিদির রাইটার্সে ঝটিকা অভিযান— জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ঘরের সামনে ধরণা এবং পুলিশ দ্বারা উৎপাটনের পর দুঃশাসন উৎখাতের প্রতিজ্ঞা। নন্দীগ্রামের নর্মদা শিট, রাধারানি আড়িদের কথাও শোনা যায় না আর। যাদের লাঞ্ছনা-দুর্দশাকে সামনে রেখে তার অগ্নিকন্যা রূপে জনমনে উত্থান এবং প্রায় তিন দশকের সাধনায় মোক্ষলাভ— তাদের স্মৃতি এখন ঝাঁপিতে বন্দি। খুললেই সাপের মতো ফোঁস মারতে পারে। দিদির বিরোধীরা আজ তা ব্যবহার করতে পারে তার বিরুদ্ধে। যেমন তিনি নিজে তা করে দেখিয়েছেন বামফ্রন্ট বিরোধিতার কালে। ষাট দশকের খাদ্য আন্দোলনের শহিদ আনন্দ হাইত, নুরুল ইসলামদের স্মৃতি তিনি তুলে এনেছেন ধর্মতলায় শাসক বামেদের লজ্জা দিতে। প্রফুল্ল ঘোষ - বিধান রায় - প্রফুল্ল সেন- অজয় মুখোপাধ্যায়- সিদ্ধার্থ রায়দের শাসনের ধারাবাহিকতায় পুলিশি লাঠিগুলির শিকার মানুষ ছিলেন বামেদের অশেষ অশ্রুমোচন এবং পবিত্র ঘৃণার আগুন উদ্‌গীরণের প্রেরণা। ক্ষমতার মেদবৃদ্ধির কালে এরাই আবার হয়ে ওঠেন বামেদের বিড়ম্বনার কারণ ও দিদির শক্তির উৎস। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ধারাবাহিকতা প্রমাণে ও উত্তরাধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠায় পঞ্চাশ-ষাটের মৃতদেহগুলি দিদির পক্ষে সম্পদ হয়ে ওঠে। চম্পলা-দীপালি-নর্মদা-রাধারানিদের সিঁড়ি বেয়ে, ২১ জুলাইয়ের কলকাতা এবং সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের লাশগুলি তাকে চূড়োয় পৌঁছে দিয়েছে। তিন বছর পর এদের স্মৃতিই হয়ে উঠেছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতীক। একটু উল্টো পাল্টা নাড়াচাড়াতেই লাশগুলো কথা বলে উঠতে পারে। প্রতিপক্ষের অস্ত্র হতে পারে।

গোদের উপর বিষফোঁড়া কামদুনি-মধ্যমগ্রামের ধর্ষিতা কিশোরীদের লাশ। পার্ক স্ট্রিট-কাটোয়া-গেদে-খরজুনার 'চরিত্রহীন' মেয়ে বৌদের 'সামান্য ঘটনা, সাজানো ঘটনা'। সুতরাং জনস্মৃতি আবেগ-নিয়ন্ত্রণ অতীব জরুরি। লাশেদের পথ অবরোধ, শোকমিছিলে নেতৃত্বদান, বুক চাপড়ে নগর-পরিক্রমা এখন পরিত্যাজ্য। দরকারে শ্মশান থেকে লাশ ছিনতাই করে আনতে হবে। দ্বিতীয় দিদি হওয়ার স্পর্ধা যারা দেখাবে, অরিজিনাল দিদি তাদের মাওবাদী কি মাকু বলে দেগে দেবে। কেস-এ ঝুলিয়ে দলের সম্পদদের দিয়ে পেটাবে। 'লাইফ হেল' করে দেবে। তপন শুকুর, অনিল বোস-বিনয় কোঙাররা এখন গ্যারেজে। তাদের জায়গা নিয়েছে আরাবুল-অনুব্রত-মণিরুল-তাপসরা। এও এক ধারাবাহিকতা। শাসনের, নিয়ন্ত্রণের। ভোটের সময়টুকুতে গণতন্ত্রের মহিমা নিয়ে কম্বুকণ্ঠে ভাষণ উৎসবের আচার মাত্র। বাকি পাঁচবছর দলতন্ত্রের কুম্ভীপাকে পেষাই হওয়াই এতকালের দস্তুর। ভাবখানা এই আমরা তো আর আকাশ থেকে পড়িনি। তোমরা ৩৪ বছর ক্ষীর খেয়েছ, এখন আমরা একটু চাখছি। তাতে কেন চোখ টাটাচ্ছে, কমরেড? আপাতত তোমরা শীতঘুমে যাও। আমরা ফণা তুলে ঘুরছি কোচবিহার থকে কাকদ্বীপ। এটাই পরিবর্তন। শান্তিপ্রিয় পাবলিককেও বুঝতে হবে স্মৃতি ও সাম্প্রতিক জনিত আবেগ লক্ষণসীমা পেরোলেই সর্বনাশ।

প্রতিপক্ষের সমস্যা অন্যরকম। এক তো হচ্ছে ৩৪ বছরের পাপের বোঝা তিনবছরে নামানো যাচ্ছে না। অকৃতজ্ঞ আমজনতা বর্গা-রেকর্ড, খাস জমি বিলি, পঞ্চায়েত-রাজ, হলদিয়া-সেক্টর ফাইভ, নন্দন-ফিল্মোৎসব মনে রাখেনি। শুধু এলসি-রাজ, আঁতুড় ঘর থেকে কবর পর্যন্ত 'আমাদের লোক না ওদের', সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম এসব মনে রেখেছে। তবে সুবিধে একটা। সাম্প্রতিক লাশেদের রঙিন তালিকা বিস্তার অতীতের মতো সাদা কালো নয়, ছাতাপড়া নয়, কিছু বুড়ো-আধবুড়ো ছাড়া বামশাসনপর্বে হামাগুড়ি থেকে কল-সেন্টার ও সিটি সেন্টারে ঢোকা প্রজন্ম বানতলায় অনিতা দেওয়ানের লাশ দেখেনি, চম্পলা-দীপালিদের নাম শোনেনি। ডুয়ার্সের চা-বাগানে মৃত্যু মিছিল, শ্রমিক ক্রোধের বিস্ফোরণে অত্যাচারী, ধর্ষক সিটু নেতা ও তার চামুণ্ডাবাহিনীর পড়ে মরার কথা জানে না। বিরাটি, ঘোক্‌সাডাঙ্গা থেকে ধানতলা— নিহহীতা, নিহত, নির্যাতিতা মেয়েদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা ধর্ষণকাণ্ড চাপা দেওয়া সিপিএম নেতা- নেত্রীদের তাদের মনে রাখার কথা নয়। কেননা তখন আদাড়ে-বাদাড়ে ভিডিও ক্যামেরা বা স্মার্ট ফোনের দৌরাত্ম্য ছিল না। তুলনায় অস্বস্তির কাঁটা বিঁধে আছে শেষের শুরুতে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে টাটা-সালিমদের জন্য বহুফসলি জমি দখল নিয়ে পুলিশ-ক্যাডারদের হুড়কো, নোটিশ লটকানো, লাঠিপেটা, বোমা-গুলি, ধর্ষণ-খুন, আগুন-লুটতরাজ, পার্টির দাদাদের হুঙ্কার, হার্মাদদের বন্দুকের ডগায় সূর্যোদয়— এসবই টিভি ক্যামেরার দৌলতে ইতিহাসের স্ট্রংরুমে বন্দি। জনস্মৃতিতে তা পুরোনো ঘায়ের মতো। কিছু পলেস্তারা পড়েছে। কিন্তু

আজকের শাসকপক্ষ তা খুঁচিয়ে তুলতেই পারে প্রয়োজন মতো। তবে আশার কথা, সাম্প্রতিকেই লাশের সাপ্লাই এত ভালো যে অতীত ফিকে হতে শুরু করেছে। সুটিয়া থেকে বামনগাছি, লাভপুর থেকে জামুরিয়া দামাল-দুষ্টু ছেলেদের প্রতাপ এতই প্রবল যে, লাশেদের সিন্ডিকেট গড়ে তুলতে হচ্ছে। নইলে হাতকাটা দিলীপদের এলাকার লাশ নাককাটা গোপালরা ছিনতাই করছে। আদি সবুজদের সঙ্গে তরমুজদের বোমাবাজিতে পাড়া কাঁপছে। এলসি-তে ধুপধুনো দেওয়ার লোকে কমে গেছে, দলের সম্পদরা অনেকেই জার্সি বদল করেছে। এসব শক্তিক্ষয় সত্ত্বেও পাবলিকের নস্টালজিয়া জাগাতে ধুনি জ্বালিয়ে রাখতে হবে। ভেবে দেখুন নাগরিকেরা,আগে এলসি, ডিডি বা আলিমুদ্দিনের টাটে বসা বিগ্রহদের পুজো দিলেই চলত। এখন তো গলির মোড়ে মোড়ে শনিঠাকুর! নৈবেদ্যর থালা চিলুবিলু এমনই যে কাকেরাও লজ্জা পাচ্ছে। সুতরাং প্রসাদ বিতরণে শৃঙ্খলা আনতে পাবলিকের মুড বদলে সাহায্য করুন। বিনীত, বিগলিত হোন। ক্ষমা চান বারবার যাতে ভোটার অতীতকে ভুলে যায়। সাম্প্রতিকের ঘন কালো মেঘ তার মনের আকাশ ছেয়ে থাকে।

মিডিয়ার ভূমিকা

স্মৃতি— সাম্প্রতিকের এই টানাপোড়েনে মিডিয়ার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ভিডিও ফিল্মের ক্যাসেটগুলি কেউটের ঝাঁপি। গণতন্ত্রপ্রিয় চ্যানেল মালিকেরা ধোপদুরস্ত সাপুড়ে। সময়সুযোগ মতো তারা শাসক বা বিরোধীদের রগড়াতে, ব্যাবসায়িক বা গোষ্ঠীগত সুবিধা আদায়ে বা পছন্দসই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে চাপ দিতে কেউটেদের বের করছেন। এই যেমন দিদির উপর খাপ্পা দুটি চ্যানেল অনুব্রত-মণিরুলদের 'পুলিশকে বোমা মারুন' বা 'পায়ের তল দিয়ে মেরে দিয়েছি' জাতীয় হুঙ্কার লাগাতার 'রিপিট' দিচ্ছে। 'চন্দননগরের মাল' দাদার কীর্তি— বিরোধীদের ঘরে রেপ করিয়ে দেওয়ার হুমকি, নিজের রিভলভার চালিয়ে বীরু-জয়দের স্টাইলে উল্টোদিকের গব্বরদের মহড়া নেওয়ার চ্যালেঞ্জ— কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার ঘরে ঘরে বাজছে। তা কচ্ছের রান পর্যন্ত শুনিয়েছে জাতীয় চ্যানেলগুলো। টলিউডে ভেজা বেড়ালের রোলে খ্যাত সাংসদ এখন বলিউডের সল্লু-সমান ম্যাচো। এইসব ডায়লগের কল্যাণেই মহাগুরুর 'মারব এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে' ডায়লগবাজিকেও হার মানিয়েছেন আমাদের পালমশাই। সংসদে তার গলা শোনা না গেলেও এই সুবাদে তিনি এখন ভারত বিখ্যাত। মিডিয়া, বিশেষ করে দিদির উপর রুষ্ট মিডিয়া তা ঘনঘন বাজাচ্ছে। বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-নেতাজির বাণী তো বছরে একবার, দু'বার। এদের বাণী অহোরাত্র, বারবার। বিস্মৃতিপ্রবণ পাবলিক যেন ভুলে না যায়। তাই পার্ক স্ট্রিট থেকে জামুরিয়া, দিদি ও তার দলের ভাঙা রেকর্ড বাজানো—'সামান্য ঘটনা, সাজানো ঘটনা, চক্রান্ত চলেছে সর্বত্র' শোনানো হচ্ছে রেকর্ডের রেকর্ড বাজিয়ে, যাতে পাবলিক বুঝতে পারবে যে, খাল কেটে কী কুমির এনেছে! অতীতের কথা ধরতাই হিসাবে আসছে কখনও-সখনও। বিশেষ করে যখন জার্সি-বদলানো কুশীলবদের এড়ানো যাচ্ছে না। এদের স্টুডিওতে পুরোনো শাসকদের মধ্যে যারা মহিলা-চরিত্র বিশারদ এবং মরুদ্যান-চর্চায় বিখ্যাত ছিলেন, তারা অনেকেই এখন প্রত্যাবর্তনকামী বিদ্যুৎজনেদের ভূমিকায়। আর পরিবর্তনকামী সুশীল সমাজের কেষ্টবিষ্টু যারা একদা গ্যালিলিও-জিওরদানো ব্রুনো কি ব্রেখ্‌টের উত্তরসূরী রূপে উদ্ভাসিত হতেন তারা এখন রুদালিদের সঙ্গে একপাতে বসে দুখ-জাগানিয়া গান গাইতে রাজি নন। এদের জায়গা নিয়েছেন যারা, তারা অনেকে গাইছেন— 'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়।'—

এসব শুনে খাবি-খাওয়া সিপিএম অক্সিজেন টানছে কি টানছে না, নেপোয় দই মারার বন্দোবস্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছেন বাংলা মিডিয়ার স্বঘোষিত কুলপতি। তিনি এখন মোদী রসে আপ্লুত। নরেন্দ্র ভাইয়ের ভারতবিজয়ী অশ্বমেধের ঘোড়াটি বঙ্গবিজয়ের তাল ঠুকছে। বড়ো বাড়ির কাগজ-চ্যানেলে সে তালবাদ্য দামামায় পরিণত। দার্জিলিং তো বটেই, আসানসোলও বিজেপি-র পকেটে। গোটা রাজ্যে ১৭ শতাংশ ভোট। লাল বাংলা সবুজ হওয়ায় দুশ্চিন্তায় ছিলেন মিডিয়া ব্যারন। এখন গেরুয়া হাওয়াকে ঝড়ে পরিণত করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। সিঙ্গুর থেকে টাটা-বিদায়ে তিনি যারপরনাই রুষ্ট হন দিদির 'রাস্তার রাজনীতিতে'। বুদ্ধদেব জমানায় টাটা-সালিমদের জন্য জমি দখলের সমর্থক ছিলেন তিনি। নন্দীগ্রামে সূর্যোদয়ের পর্বে ক্যাডারদের বাড়াবাড়িতে কুপিত হন। কাগজ-চ্যানলের সার্কুলেশন টিআরপি-ও মার খাচ্ছিল। ফলে তিনি উল্টো সুর ধরেন। এতে সিপিএমের অনেকে ব্যথিত হয়ে আক্ষেপ করেছেন— বুদ্ধদাকে গাছে তুলে মই কেড়ে নিলেন দাদা! সেই তিনি এখন মোদীর বাজার বিপ্লবের মন্ত্র বাংলার ঘরে ঘরে ছড়াতে বদ্ধপরিকর। কিছুকাল আগেও তিনি মনমোহনী সিংহ গর্জন শুনতে ভালোবাসতেন। বিশেষ করে সিঙ্গিমশাই প্রকাশ কারাতের মুখে নুড়ো জ্বেলে আমেরিকানদের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি করার পর তিনি তো হরির লুট লাগান। কিন্তু সোনিয়া-রাহুল তাদের ঘিরে থাকা ঝোলাওয়ালাদের চক্করে পড়ে একশো দিনের কাজ, গরিবদের খাদ্যের অধিকার, হকারদের রাস্তায় বসার অধিকার এইসব হাবিজাবি আইন করে সরকারি টাকার ভুষ্টিনাশ করায় তিনি ভয়ংকর রেগে যান। তিনি ও তার সমধর্মীরা চান গরিব ও মধ্যবিত্তকে ভর্তুকি বন্ধ করে পুঁজিপতিদের ঢেলে দাও। তেলা মাথায় তেল দিলে তা চুঁইয়ে পড়বে তলায়। এতেই গরিবের পেট ভরবে। তার উপর বিদেশি বণিক, ধনকুবেরদের ঢালাও নেমতন্নে নানা বিধি নিষেধ, হতচ্ছাড়া লেবারদের যখন খুশি ছাঁটাইয়ের অধিকার দিতে গড়িমসি। ব্যাস, সিঙ্গি মেনি-বেড়ালে পরিণত হলেন বড়ো মিডিয়ার বড়ো বাবুর কাছে। তারপর থেকে তার ধ্যানজ্ঞান— মোদী লাও, দেশ বাঁচাও।

দিদির সঙ্গে তার ভাবসাবের চেষ্টা চলে মাঝেমধ্যেই। এই তো কদিন আগে কোটি কোটি টাকার সরকারি বিজ্ঞাপন বেরোল বাজারি কাগজে। কিন্তু জমির গেরোয় আটকে যাচ্ছে। তা সে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের পছন্দসই জমি দখলের ইস্যু হোক বা কলকাতার কালাসাহেবদের সাধের বাগানবাড়ি— গলফ্ ক্লাবের জমি, ট্যাক্সো নিয়ে। এসব নিয়ে বখেরা। খেপে গিয়েছেন বাজার সাম্রাজ্যের বড়োবাবু। এতটাই যে আগের মতো মেঘনাদের স্টাইলে আড়ালে আড়ালে খেলছেন না আর। সবুজ বাংলাকে গেরুয়া করায় ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছেন। অযোধ্যা ১৯৯২ বা গুজরাত ২০০২-এর স্মৃতি মুছে ফেলতে, সোহবারউদ্দিন, ইসরাত জাহানের লাশ সরিয়ে ফেলতে তিনি অতি-তৎপর। একদা ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজা ওড়ালেও এবারে ভোটের সময় মোদীর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী তাড়ানোর হুমকির আড়ালে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের রাজনীতিকে ঠারেঠোরে সমর্থনই জানিয়েছে সাম্রাজ্যের অধীন কাগজ-চ্যানেলগুলো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্র মোদীকে 'হরিদাস' বলায় তাঁর রাগ তাঁরই গোমস্তাদের

কলমে ঠিকরে বেরিয়েছে। অবশ্য ভোট-বাজারে কেউই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। জাতপাত, ধর্ম, ভাষা, ইত্যাদি নানা তাস খেলে ক্ষমতার পথে যাত্রা সব দলেরই। কিন্তু এই মিডিয়া-ব্যরন ও তার মোসাহেবরা অন্যদের ভোটব্যাংক রাজনীতিকে গাল দিলেও মোদী ও তাঁর বাহিনীকে যুধিষ্ঠির-স্মারক মেডেল পরিয়েছেন। দিদিকে মোচড় মারতে তিনি একদিকে মোদীর সঙ্গে সমঝোতার মন্ত্র দিচ্ছেন, অন্যদিকে কাটোয়া-কামদুনি-বামনগাছি এবং অনুব্রত-মণিরুল-তাপসদের উপর দাগা বুলোচ্ছেন। বানতলা- ধানতলা, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম তার চ্যানেলে-কাগজে আর ভেসে ওঠে না।

অবশ্য দিদি 'ডিসস্ট্রেসড জ্যামসেল' বা বিপন্ন বালিকাটি নন নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধে তড়পাচ্ছে তো কি হয়েছে। তিনিও হাতের কলম ছুঁড়ে মারছেন। জনসভায় গলা ফুলিয়ে ধমকাচ্ছেন। পছন্দের কাগজ-চ্যানেলের লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছেন সরকারি লাইব্রেরিতে। হুমকি দিচ্ছেন, পাবলিককে বলে দেবেন কোন্ কাগজ পড়া বা চ্যানেল দেখা পরিবর্তন-বিরোধী। তার হাতেও চ্যানেল-কাগজ তো কম নয়। সারদা-সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ার আগে গৌরী সেনের বদান্যতায় অনেকগুলি চ্যানেল-কাগজ দখল করেছে দিদির ভাইয়েরা। তাদের কেউ কেউ এখন সেমসাইড গোল করার ভয় দেখানোয় জেলের ঘানি টানছে। কর্ত্রীভজাদের সম্প্রদায় সরকারি-বেসরকারি সাহায্যে পাল্টা প্রচার-যুদ্ধ চালাচ্ছে। টিআরপি-র লড়াইতে পিছিয়ে থাকলেও তারা পবিরর্তনের তিন-বছরিয়া সাফল্যের সাতকাহন শোনাচ্ছে। গুজরাত মডেলের পাল্টা বেঙ্গল মডেল নিয়ে নেতা-মন্ত্রী-বশংবদ বিদ্বৎজন বকে বকে মুখে ফেকু তুলছেন। এরই ফাঁকে তাপসী মালিকদের স্মৃতি তুলে আনছেন পর্দায়। 'অপপ্রচার' সম্পর্কে সাবধান করছেন। বস্তুত, সন্ধ্যাবেলায় দুই তরফের চ্যানেলে চ্যানেলে ধোপদুরস্ত নেতা-উকিল বুদ্ধিজীবীদের খেউড়-তরজা হুতোমী কালের মুৎসুদ্দিবাবু, হঠাৎ-নবাবদের বৈঠকখানায় মোসাহেবদের নরক গুলজারের দৃশ্য মনে পড়ায়। শুনলে মনে হবে আমরা একই সঙ্গে হাল্লার রাজা ও তার হারানো ভাই শুন্ডির রাজার রাজত্বে বাস করছি। একটায় জঙ্গলের রাজত্ব, সর্বক্ষণ যুদ্ধ-পরিস্থিতি, ঘরে ঘরে কান্নার রোল। আর একটায় উন্নয়নের বন্যা, শান্তি-সৌহার্দ্য উপচে পড়ছে, ঘরে ঘরে হাসির ফোয়ারা। একপক্ষের কাছে দিদি মুক্তির দিশারি মাতঙ্গিনী প্রীতিলতা বা জোয়ান অফ আর্ক-এর বঙ্গীয় সংস্করণ। অপর পক্ষের কাছে তিনি সন্দেহবাতিকগ্রস্ত জটিলা-কুটিলা, প্রতিহিংসা-পরায়ণ রোমান সম্রাট ক্যালিগুলার শাড়িপরা এডিশন। যে যার মতো খড়-মাটি-রঙ চাপাচ্ছে। এই মণ্ডপে মা সাক্ষাৎ করালবদনী শ্মশানকালী, ওই মণ্ডপে মা কল্যাণময়ী, বরাভয়দাত্রী।

লঙ্কায় যে যায় সেই হয় রাবণ

আমপাবলিকের অধিকাংশ ইতিহাসের ধারাবাহিকতা, জোয়ান অফ আর্ক-এর ক্যালিগুলায় রূপান্তরের অনিবার্যতা বা অসম্ভাব্যতা নিয়ে কূট-কাচালিতে মাথা ঘামাতে রাজি নয়। নিজেদের বারোমাস্যার অভিজ্ঞতা থেকে তারা বড়োজোর ঠোঁট উল্টে বলেন— 'লঙ্কায় যে যায়, সেই হয় রাবণ'। কেউ আবার বলেন, মায়ের অনেক রূপ দেখার জন্য এখন আর রামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টি দরকার নেই। অনুগত, ভক্তদের কাছে তিনি বগলা, একই পথে পাপীতাপীদের কাছে ছিন্নমস্তা। 'ওরে পাগল, মা কি তোর একার!'

ক্ষমতার নানা রূপ, নানা অবতার যুগে যুগে এ ভাবেই প্রকট— এসব শুনলে পরিবর্তন ও প্রত্যাবর্তন দুই পন্থার পন্থীরা তো বটেই, আগমার্কা বিপ্লবীরাও চটে যান। কারণ এতে মুড়ি-মিছরি এক দর ধরার নৈরাজ্যবাদী প্রবণতা বিদ্যমান। শিবিরগুলির বিভাজক চিহ্নগুলি গুলিয়ে যায়। ছেদবর্ষ বা পর্বগুলি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ভালো ও মন্দের সহাবস্থানের বিভ্রম তৈরি হয়। শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তির দিশা, প্রগতির বার্তা থাকে না। থাকে থোড়-বড়ি-খাড়ার ক্লান্তি, অসহায়তা অবসাদ। ফলে ক্ষমতাতন্ত্রের পতাকা বদলে বিশ্বাস রেখে দলতন্ত্রের দাড়িপাল্লায় শাসনের খণ্ডপর্বকে মাপাই দস্তুর। এটাই প্রগতিশীলতার লক্ষণ। যারা ভোটবাজ পার্টিগুলিকে একই ঝাঁকের কই বলে নস্যাৎ করে সেই বিপ্লবীরা তাদের রাজত্বে গণতন্ত্র, ন্যায় ও সাম্যের স্বর্গ গড়ার দাবিদার। তবে সেখানেও শাসক দল বা শিবিরে না থাকার পরিণতি ভয়ংকর। 'আমরা-ওরা'র যুদ্ধ একই রকম সর্বগ্রাসী, নৃশংস। স্রেফ গরিব মানুষ হলেই রেহাই নেই। লালগড়ে তাই কিষেণজিদের রমরমার সময় সিপিএম সমর্থক সালকু সোরেনকে খুন করে তার মৃতদেহ সৎকার না করতে দিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখার মধ্যে কোনো অন্যায় দেখতে পাননি কুলীন শ্রেণি-সংগ্রামীরা। হার্মাদ বা পুলিশের চর সন্দেহে গরিব-বড়োলোক আদিবাসী-মাহাতো-বর্ণহিন্দু নির্বিশেষে নির্বিচার খুন, এমনকি পূর্ব সহযোগীদেরও শত্রুজ্ঞানে কোতল ঘটেছে। আজ যারা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে মধ্যমগ্রাম-বামনগাছি-লাভপুরের ধারাবাহিকতা দেখতে পাচ্ছেন, তারাও অনেকে কিষেণজিদের প্রশ্ন করার সাহস পাননি। প্রয়োজন অনুভব করেননি। মুষ্টিমেয় সংশয়ী এসব নিয়ে প্রশ্ন তুললে গতে বাধা উত্তর মিলেছে, বিপ্লব ভোজসভা নয়। প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে গেলে গরিব বা আদিবাসী বলে দয়া করা যাবে না। তাছাড়া বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের কালে রণাঙ্গণে মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ছাঁটাই অনিবার্য। কিছু খুন জখম ভুলভাল হলেও যুদ্ধে এমন ঘটেই থাকে। এ নিয়ে মড়াকান্না বুর্জোয়া ভাববাদ। শুনতে শুনতে মনে হতে পারে ইরাক আফগানিস্তানে আমেরিকানদের বোমা-গুলিতে নিহত নারী-শিশুদের সম্পর্কে বুশ বচনের প্রতিধ্বনি শুনছি---'কোল্যাটারাল ড্যামেজ'— হাতিদের লড়াইতে কিছু পিঁপড়ে মরবেই। যেমনটা এখন শুনছি গাজায় ইজরায়েলি হানায় ছিন্নভিন্ন অসামরিক জনতা সম্পর্কে ইহুদি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানইয়াহু-র সাফাই।

একই রকম যুক্তি, ছত্তীসগড়ে-ঝাড়খণ্ডে-মহারাষ্ট্রে মাওবাদীদের মোকাবিলা করতে গিয়ে সিআরপি বাহিনীর চাঁদমারির শিকার হতদরিদ্র আদিবাসী গ্রামবাসীদের সম্পর্কে শোনা যায় আমাদের নেতা-মন্ত্রী-সান্ত্রীদের মুখে। তাদের মোদ্দা কথা : দেশের শত্রুদের নিকেশ করতে গেলে সংবিধান, আইনকানুন শিকেয় তুলে রাখতে হবে। সংবিধান,গণতন্ত্র যারা মানে না তাদের জন্য ওগুলো রদ্দি কাগজের বান্ডিল। তাছাড়া মাওবাদী-আদিবাসী আলাদা করাও মুশ্‌কিল। কাশ্মীর-মণিপুরে সন্ত্রাসবাদী আর আমজনতার মতোই এরাও একই ঝাড়ের বাঁশ। অত বাছাবাছি না করে ভুনে দেওয়াই ভালো। 'সংঘর্ষে' মৃত উগ্রপন্থী-র তালিকার সরকারি চোতায় শুধু নাম বদলে যায়। দলের নামে খুন হলে কাগজে-চ্যানেলে, কোর্টে কতরকম ফ্যাকড়া। পুলিশ একটু ডান্ডা চালালে, জলকামান- কাঁদুনে গ্যাস কি গুলি ছুড়লে কত বিক্ষোভ মিছিল। তদন্ত কমিশন-কমিটি,গণতন্ত্র নিয়ে মড়াকান্না। দেশের নামে খুন-ধর্ষণ-ঘর জ্বালানোর সুবিধে এটাই যে এতে সচরাচর কেউ রা কাড়ে না। উল্টে সরকারি মেডেল মেলে। দেশপ্রেমের পুরস্কার। দেশের দুশমনদের স্মৃতি, নাম

ও নিশান মুছে ফেলাই শাসক ও বিরোধীপক্ষ এবং মিডিয়ার সম্মিলিত জাতীয় কর্তব্য।

এই গণতান্ত্রিক ঐক্যের ভরসাতেই পরীক্ষার্থী মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসা জনসাধারণের কমিটির ফেরার সভাপতি লালমোহন টুডু কি রঞ্জার জঙ্গলে ঘুমন্ত সিধু সোরেন ও তার পাঁচ সঙ্গীকে মেরে দাও। বন্দি কিষেণজিকে খড়ের গাদার মতো বেয়নেটে খুঁচিয়ে, রাষ্ট্রীয় প্রতিশোধের ষোলোকলা পূর্ণ করে জঙ্গলে যুদ্ধের নাটক সাজিয়ে রাখো। একি আলেকজান্দার আর পুরুর কাল যে পরাজিত যোদ্ধা মর্যাদা পাবে! আধুনিক সময়ের জেনেভা কনভেনশন, যুদ্ধবন্দিদের প্রতি আচরণের নানা আন্তর্জাতিক বিধিনিয়ম মানামানি নিয়ে যারা ক্যাঁচরম্যাচর করবে তাদের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দাও। জিএন সাঁইবাবার মতো পঙ্গু, হুইলচেয়ার-বন্দি হলেও জেলে পোরো। চিদাম্বরম-মোদী, রমন সিংহ-অজিত যোগী, বুদ্ধ-মমতা যত বখেরাই থাক, সকলের সাধের কদলীবনে মত্ত হাতির হামলা রুখতে গণতান্ত্রিক ঐক্য জরুরি। হতে পারে চন্দ্রবাবু বা রাজশেখর রেড্ডির পথ ধরে দিদি কিষেণজিদের মই বানিয়ে জঙ্গলমহলে পা রেখেছেন, নন্দীগ্রামে হার্মাদদের সামলাতে মাওবাদীদের বন্দুক-বোমা শুভেন্দুও তাকে ভরসা দিয়েছে। কিন্তু রাইটার্স দখলের পর আগের শুভঙ্করী তো স্লেট থেকে মুছতেই হবে। যৌথবাহিনী এখন জনগণের বন্ধু। সরকার এখন মা-মাটি- মানুষের। হার্মাদদের জায়গা ভৈরব বাহিনী নিয়েছে বলে কাঁদলে হবে! জঙ্গলমহলে মাও রাজত্ব বহাল রাখার ম্যাও ধরলে তো মরতেই হবে! এক আকাশে যে দুই সূর্য থাকে না সোনা!

যারা যখন যেখানে ক্ষমতায় তারাই সন্ত্রাস চালাবে এটাই কি তবে আমাদের নিয়তি? আমরা মানে যাদের নাগরিক, মানুষ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, জনগণ, আমজনতা, পাবলিক, কমন ম্যান, জনগণেশ ইত্যাদি গালভরা নামে ডাকা হয়। সন্ত্রাসের রকমফের হয় বটে। কেউ হালাল করে, কেউ ঘচাং করে বলি দেয়। কেউ জ্যান্ত কিমা বানায়। তার আগে গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র, পরিবর্তন-প্রত্যাবর্তন, বিপ্লব-প্রতিবিপ্লব, দেশ-রাষ্ট্র, জাতি-সমাজ, ধর্ম-বর্ণ-আঞ্চলিকতার নানা খাঁচায় আমাদের বন্দি রাখে। পোলট্রির মুরগি বা চালানি পাঁঠাদের মতো আমাদের বেড়ে ওঠা, বেঁচে থাকা, গণতন্ত্র নিয়ে হ্যাজানো আখেরে মুণ্ডচ্ছেদের অপেক্ষায়। এছাড়া কি বাঁচার রাস্তা নেই? দেশে দেশে এই প্রশ্ন উঠছে। আমাদের দেশেও। গুঞ্জন বাড়ছে, দলের পতাকার রঙ, শাসক ও বিরোধীদের ঢঙ দেখে ভুলে থাকব না আর। রামে-রাবণে আখেরে সমান বলে কপাল চাপড়ে ক্ষান্ত হলে আমাদের কপাল আরও পুড়বে। প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরগুলোর গোলকধাঁধায় ঘুরে না মরে, নিজেদের রাগ-দুঃখ-ক্ষোভ-ঘৃণা, প্রতিবাদকে দলের বেড়ায় না বেঁধে বেরোতে হবে। প্রতিপক্ষের শাসনপর্বের সীমান্তে জনস্মৃতি আটকে রাখার চৌকিদারি ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে হবে। ভেঙে ফেলতে হবে আমরা-ওরার লক্ষণরেখা। রাম-রহিম, যে যেখানে মরছে, পুড়ছে প্রবল ক্ষমতাবানদের আক্রমণে, তারই পাশে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে। জনসমুদ্রে জোয়ারের টান শুরু হয়েছে। না, কোনো ছেলে ভুলোনো রূপকথায় বিশ্বাস করে একথা বলছি না। আমজনতা এক ছাঁচে গড়া বা এক ঢালা ভিড় নয়। তাদের মধ্যে হাজারো ভাগ, দ্বন্দ্ব-ধন্দ-সংঘাত। দলগুলিও উঠে যাবে না। পতাকাগুলিও হারিয়ে যাবে না। নানা দলীয় নেতৃত্বও থাকবে। শাসকের ভূমিকায় তাদের ভোল বদলও চলবে। তবু প্রলম্বিত অন্ধকারে আলোর দিশা হতে পারে একটাই। ভোটের পরও আমাদের প্রতিনিধিত্বের দাবিদারদের জনতার দরবারে জবাবদিহি সুনিশ্চিত করার জন আন্দোলন, গণ-উদ্যোগ। তার জন্য ছোটো ছোটো প্রতিবাদ-প্রতিরোধগুলিকে মিলতে হবে। দলেরা আসুক, থাকুক। কিন্তু দলের লেজুড়বৃত্তি নয়, স্বাধীন গণপরিসরে ডানা মেলুক আক্রান্তের কণ্ঠস্বর। সহমর্মিতায় যেন না থাকে ছকবাজি। রাজনীতির চর্চা হোক তুমুল, দলবাজির নয়। জাগ্রত জনতার অঙ্কুশ বিনা ক্ষমতায় মদমত্তদের সামলানো সম্ভব নয়। যুগে যুগে বিদ্রোহ-বিপ্লব ওই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা থেকেই। জনস্মৃতি, গণঘৃণা ও প্রতিবাদ যেদিন স্রেফ জমানা বদলের হাতিয়ার না হয়ে প্রকৃত জনতার ক্ষমতা কায়েমের অস্ত্র হবে, যে কোনো রঙের শাসকদের উপর নিচু তলার মানুষের সার্বভৌমত্বের ধারণা আর কিতাববন্দি থাকবে না এই বঙ্গেও, সেদিন ক্ষমতাতন্ত্রের ধারাবাহিক পাপের ইতিবৃত্ত নিয়ে এহেন প্রবন্ধ ফাঁদার প্রয়োজনও ফুরোবে। পথ এখনও অনেক বাকি।□

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : *দুর্বার ভাবনা*, আগস্ট ২০১৪।